WBMDFC

KNOWLEDGE SERIES X

স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক

মুখবন্ধ

সমাজ ইতিহাসের ধারায় দেখা গেছে কিছু কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-এর দ্বারা অনন্য হয়ে ওঠেন। সততা, মুক্ত চিন্তা ও মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাদের ব্যক্তিত্ব নিজ প্রজন্ম ও পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ।

'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম' বিগত দিনের বাংলার কয়েকজন মনীষীর জীবন ও কর্মসাধনার বিবরণ একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র ও পুস্তিকার (WBMDFC-Knowledge Series) মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। এদের কর্মসাধনা ও জীবনব্রত পাঠে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই অনুপ্রাণিত হবে বলে আমাদের ধারণা। এই মহৎপ্রাণ মানুষদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের মাধ্যমে।

ডঃ পি. বি. সালিম, আই.এ.এস
চেয়ারম্যান
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

ভূমিকা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে কিছু মানুষ নিজের মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং ত্যাগ দ্বারা হয়ে ওঠেন কালজয়ী। মুক্ত চিন্তা, ত্যাগ ও মানবজাতির সেবার মাধ্যমে তাদের কাজ চিন্তাভাবনা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এরূপ মনীষীগণের জীবন ও কর্মসাধনা এ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার প্রয়াস করেছে। WBMDFC- Knowledge Series বিভাগের প্রথম পর্যায়ে চারজন মনীষী হাজি মহম্মদ মহসিন, ডঃ হাসান সোহরাওয়ার্দী, তিতুমির ও ভগিনী নিবেদিতার কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

WBMDFC- Knowledge Series-এর দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো কতিপয় মনীষী যেমন বেগম রোকেয়া, বেনীমাধব বড়ুয়া, স্যার আজিজুল হক এবং লালন শাহ-এর কর্মসাধনা অতিসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা আশা রাখি স্যার আজিজুল হক সম্পর্কে এই পুস্তিকাটি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপকৃত হবে।

মৃগাঙ্ক বিশ্বাস
ওএসডি এবং এক্স অফিসিও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক

(১৮৯২-১৯৪৭)

প্রকাশ কাল
মিলন উৎসব
ফেব্রুয়ারি, ২০২২
পরিমার্জিত সংস্করণ
ফেব্রুয়ারি ২০২৩
জুন ২০২৩

পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক দপ্তরের অধীনস্থ একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা)

Printed at Saraswaty Press Limited

স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক

(১৮৯২-১৯৪৭)

প্রাক স্বাধীন ভারতে অবিভক্ত বাংলায় বহু বর্নিল চরিত্রের বাঙালীর আবির্ভাব হয়েছিল। মন মানসিকতা এবং কর্মোদ্যোগে তারা বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও শিক্ষার জগতকে অনেকটা অগ্রসর করে দিয়েছিলেন। পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থেকেও কর্মোদ্যোগী মানুষেরা যে কত কাজ করে য়েতে পারেন, স্যার মোহাম্মদ আজিজুল ছিলেন তাঁর অনন্য দৃষ্টান্ত।

পলাশী যুদ্ধোত্তরকালে বাংলা তথা ভারতে ইংরাজ শাসন সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে প্রশাসিনক কাঠামোয় এক মৌলিক পরিবর্তন আসে। শিক্ষা ও চাকুরী থেকে বঞ্চিত হওয়ায় মুসলমানরা চরম দুর্দশায় পতিত হয়। অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক দিক হতে তারা ঘোর অমনিশায় আটকে পড়ে। এই পশ্চাৎপদতা থেকে উদ্ধারকল্পে অবিভক্ত বঙ্গে মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে আবির্ভূত হন স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক। তিনি ছিলেন, একাধারে সফল আইনজীবী, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ, উদারনৈতিক শিক্ষাবিদ, প্রখ্যাত সাংসদ (Parliamentarian), সুসাহিত্যিক, বহুভাষাবিদ, সুদক্ষ কূটনীতিবিদ, মুসলিম শিক্ষার প্রবক্তা ও সামাজিক চিন্তাবিদ।

স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক বহুমুখী প্রতিভাধর অনন্যসাধারণ এক বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিত্ব। উপনিবেশিক পরিকাঠামোয় যার জীবনের ব্যাপ্তি ও ভিত্তি। উপনিবেশিক বাংলার সমাজ সংস্কারক

হিসাবে তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন সমাজ সংস্কার করতে। বাংলা তথা ভারতের অস্থির দোদুল্যমান রাজনৈতিক সময়ের এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি। সারাজীবন বহু সরকারী পদে আসীন ছিলেন। তাঁর প্রদত্ত মতাদর্শ, চিন্তা-ভাবনা ছিল সময়ের অগ্রবর্তী। প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা এই বিস্মৃতপ্রায় ব্যক্তিটির কর্মদক্ষতা ও সংগঠন ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। সারাজীবন অর্ধশতের বেশী প্রতিষ্ঠান, কমিটি, কমিশনের সদস্য, সম্পাদক ও সভাপতিরূপে নিয়োজিত ছিলেন। সেকালের বাংলার রাজনীতিতে নীলরক্তের অধিকারী না হয়েও তিনি বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতিতে তথা বাংলার জমিদার ও ইংরেজ রাজশক্তির মধ্যে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। বলা যায়, তাঁর নিরন্তর কর্মমুখী প্রেরণা তাঁর জীবনসোপানের উৎস।

১. জন্ম ও বংশ পরিচয়

স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হকের জন্ম তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গের নদীয়া জেলার শান্তিপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। জন্ম ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর, মৃত্যু ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে মার্চ। ক্ষণজীবী মানুষ। পিতা মুনশী মোহাম্মদ মুনিরুদ্দিন। যুগ সন্ধিক্ষণের কবি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) ছিলেন তাঁর আপন কাকা। আজিজুল হক শৈশবে মাতৃহীন হলে তাঁর স্নেহময়ী কাকিমা রহিমুন্নেসার নিকট লালিত পালিত হতে থাকেন এবং পিতৃত্ব মোজাম্মেল হকের অভিভাবকত্বে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

আজিজুল হকের সমকালীন সময়ে শান্তিপুর ছিল এক জমজমাট মিউনিসিপ্যাল শহর। শান্তিপুরের বৈষ্ণব প্রভাবিত হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সৌহার্দ্যমূলক পরিবেশে আজিজুল হক

বাল্যকাল অতিবাহিত করেন। তখন শান্তিপুর ছিল বাংলা ভাষা চর্চার অন্যতম পীঠস্থান। আজিজুল হক তথা মোজাম্মেল হকের আদি পুরুষদের বাসস্থান নদীয়া জেলার শান্তিপুরে ছিল না। বিখ্যাত বারো-ভূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলার সোনার গাঁওয়ে এক সময় তারা বাস করতেন। বর্গীর অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে মোজাম্মেল হকের পূর্বপুরুষগণ সোনার গাঁ ত্যাগ করে নদীয়ার শান্তিপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। [সূত্রঃ আজাহার ইসলাম, মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৯]

২. ছাত্রজীবন

আজিজুল হকের ছাত্রজীবন শুরু হয় তাঁর পিতামহ প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক বিদ্যালয়ে আরবী ও বাংলা শেখার মাধ্যমে। পিতা মনিরুদ্দিন আহমেদ পৈতৃক জমি-জায়গা দেখাশুনা করতেন। পিতৃব্য মোজাম্মেল হকের তত্ত্বাবধানে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। ১৯০৭ খ্রীঃ তিনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল ইংরাজী হাইস্কুল হতে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৯০৯ ও ১৯১১ খ্রীঃ কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হতে তিনি যথাক্রমে এফ.এ. ও বি.এ. পাশ

করেন। পরে ইউনিভার্সিটি ‘ল’ কলেজ হতে তিনি ১৯১৪ সালে বি. এল. ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯০৭ হতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতার বেকার হোস্টেলে থাকতেন। ছাত্রজীবনের এপর্বে তিনি ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিনি মুসলিম ইনস্টিটিউটের কর্মকাণ্ডে এবং পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাদি বিষয়ে ইনস্টিটিউটের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় উপরোক্ত সময়কালে তিনি মুসলিম ইনস্টিটিউটের সেক্রেটারি (১৯১১-১২), দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মহামেডান এডুকেশান এসোসিয়েশন-এর যুগ্ম সম্পাদক, ‘দি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মুসলিম লীগ’-এর সহ-সম্পাদক, ‘নদীয়া আনজুমান ইত্তেফাকে ইসলাম’-এর যুগ্ম-সম্পাদক পদে বৃত ছিলেন।

৩. সংসারজীবন

আজিজুল হকের বিবাহ হয় হুগলী জেলার শিমলাগড়ের জমিদার মোহাম্মদ আবু সাঈদের কন্যা কানিজ খাতুনের সঙ্গে। বিবাহ সম্পন্ন হয় ১৯১৫, মে মাসে (১০ই জৈষ্ঠ ১৩২২ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ৯ রজব)। আজিজুল হক ও কানিজ খাতুনের পাঁচপুত্র ও পাঁচ কন্যা ছিল।

৪. কর্মজীবন

১৯১৪ খ্রীঃ বি.এল. পরীক্ষায় পাশ করার পর তাঁর অভিভাবকরা চাইলেন তিনি যেন সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন। এসময় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের প্রস্তাব পেলেও তিনি এতে যোগদানের অসম্মতিজ্ঞাপন করেন। এর পরিবর্তে তিনি ১৯১৫ সালে কৃষ্ণনগর জেলা কোর্টে আইনজীবী হিসাবে আইনব্যবস্থা শুরু করেন। এখানে তিনি স্থায়ীভাবে বসতি শুরু করেন। তবে তাঁর

কর্মজীবন শুরু হয় যখন তিনি ১৯২৪ খ্রীঃ নদীয়ার সদর মহকুমা হাঁসখালি থানার হাঁসখালি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হলেন। ১৯২৬ খ্রীঃ তিনি নদীয়া জেলার সরকারি উকিল ও পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে নিয়োজিত হন। ১৯২৬ খ্রীঃ তাঁর জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৯২৬ খ্রীঃ তিনি নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং তিনি নয় বছর (১৯২৬-১৯৩৪) নদীয়া জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি প্রথম বাংলার আইন পরিষদে প্রবেশ করেন ১৯২৭ খ্রীঃ, সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে।

১৯২৮ খ্রীঃ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৯ খ্রীঃ তিনি পুনরায় বাংলার আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩১ খ্রীঃ আজিজুল হক Indian Franchise Committeeর সদস্য মনোনীত হন। পরের বছর তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং ইনকোয়ারি কমিশন, Bengal Retrenchment Committee, 1932 এবং বেঙ্গল বোর্ড অব ইকোনোমিক ইনকোয়ারি'র সদস্য হিসাবে কাজ

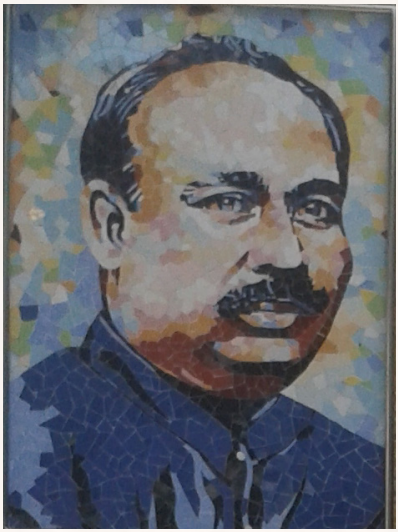

করেন। তিনি রেলওয়ে এ্যাডভাইজরি কমিটি ও বাংলার আইন সভার পাবলিক একাউন্টস কমিটিতে কাজ করেন এবং বেঙ্গল বোর্ড অব ইন্ড্রাস্ট্রিজ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীঃ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন।

আজিজুল হক ১৫ই জুন ১৯৩৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৬ খ্রীঃ পর্যন্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি রেজিস্ট্রেশন ও ওয়াকফের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৩৭ খ্রীঃ ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় আজিজুল হক বাংলার বিধানসভার প্রথম স্পীকার নির্বাচিত হন এবং ১৯৪২ খ্রীঃ পর্যন্ত ঐ পদে আসীন ছিলেন। ১৯৩৮-১৯৪২ খ্রীঃ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর ছিলেন। ১৯৪২-৪৩ খ্রীঃ পর্যন্ত বড়লাট কর্তৃক নিযুক্ত যুক্তরাজ্যে ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি দিল্লীতে গভর্নর জেনারেলের শাসন পরিষদে শিল্প ও বাণিজ্য সদস্য ছিলেন।

উপরোক্ত বিষয় ব্যতিরেকে, তিনি অনেক খ্যাতনামা কমিশন, কমিটি ও প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল— বেঙ্গল ফিলম সেন্সর বোর্ড, কামাল

ইয়ার জং এডুকেশন কমিশন, বেঙ্গল রিট্রেঞ্চমেন্ট কমিটি, বেঙ্গল জুট ইনকোয়ারী কমিটি, টেক্সট বুক কমিটি, ফ্লাউড কমিশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠন কমিটি ইত্যাদি।

(সূত্রঃ ইকবাল ভূঁইয়া, স্যার আজিজুল হক, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৯-২১; বাংলা পিড়িয়া, ঢাকা, মার্চ ২০০৩, পৃ. ৩৮৬-৩৮৮)

৫. লেখক জীবন

স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন না, তিনি নিজেকে সৃজনশীল সাহিত্যিক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলার দোদুল্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি তার লেখনী চালিয়ে গিয়েছিলেন। আজিজুল হক সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে শুধু কলম ধরেন নি, তাঁর অভিপ্রায় ছিল সমাজের শিক্ষা ও অর্থনীতির উন্নতির মাধ্যমে দেশ ও দশের হিতসাধন করা। তিনি কবিতা দিয়ে লেখক জীবন শুরু করলেও, পরবর্তীতে তথ্যধনী গ্রন্থের লেখক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

(সূত্রঃ ইকবাল ভূঁইয়া, ঐ পৃ. ২৮)

লেখক হিসাবে তিনি বাংলা ও ইংরাজীতে সমান দক্ষ ছিলেন। সমকালীন বাংলায় প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তিনি লিখতেন। তবে তাঁর বাংলা রচনার সংখ্যা অতি নগন্য, মাত্র তিনটি কবিতা, দুটি প্রবন্ধ ও দুইটি লিখিত ভাষণ বাংলায় লিখেছিলেন। তাঁর রচনার একমাত্র মাধ্যম ছিল ইংরাজী। মোহাম্মদ আজিজুল হকের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় সেকালের মর্যাদাবান মাসিক সাহিত্য পত্রিকা ‘মোসলেম ভারত’এর প্রথম সংখ্যায় ১৯২০ খ্রী (বৈশাখ ১৩২৭ বঙ্গাব্দ)। আজিজুল হক প্রকাশিত ঐ রচনার নাম

ছিল ‘ভারতের দান’ নামক একটি কবিতা। সরোজিনী নাইডুর (১৮৭৯-১৯৪৯) ‘দি গিফট অব ইন্ডিয়া’ (The Gift of India) কবিতা অবলম্বনে ‘ভারতের দান’ শীর্ষক ২৪ চরণের কবিতাটি তিনি লিখেছিলেন।

প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক শত ব্যস্ততার মধ্যেও, সময় ও ইতিহাসের পেক্ষিতে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা আন্তর্জাতিক পাঠক মহলে আজও সমানভাবে সমাদৃত। তাঁর অমর রচনাবলী গুলি হল—

১. History and Problems of Moslem Education in Bengal. (1917)

২. The Man behind the Plough (1939)

৩. Education and Retrenchment (1924)

৪. A Plea for Separate Electorate in Bengal (1931)

৫. A Cultural Contribution of Islam to Indian History (1931)

৬. The Sword of the Crescent Moon (1984)

৭. হজরত মহম্মদের জীবনী (অপ্রকাশিত)

৬. শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক

স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক ১৯৩৪-৩৬ খ্রীঃ পর্যন্ত অবিভক্ত বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। আজিজুল হক দায়িত্ব গ্রহণের একমাস পর অর্থাৎ ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় শিক্ষাবিভাগের সকল কর্মকর্তাদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তুলতে এই সম্মেলন মূখ্য ভূমিকা

পালন করে। জেলা পরিদর্শকগণ নিজ নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাগুলো তুলে ধরেন, যার ভিত্তিতে নানা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। যে সব এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় কম সেখানে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়।

(সূত্রঃ ড. মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুম, ব্রিটিশ আমলে বাংলার মুসলিম শিক্ষা সমস্যা ও প্রসার, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৭১)

১৯৩৫ খ্রীঃ জুলাই মাসে শিক্ষামন্ত্রী মোহাম্মদ আজিজুল হক বাংলার সঠিক শিক্ষা সমস্যা ও অগ্রগতি সম্পর্কে এক রেজুলেশন ঘোষণা করেন। এতে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা ও বাধাবিপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক ব্যক্তিগতভাবে একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে ও জনশিক্ষা কমিটির সহায়তায় প্রথমবারের মত কলকাতায় ১৯৩৬ খ্রীঃ ৩১শে জানুয়ারী 'শিক্ষা সপ্তাহ পালন' ও 'একটি শিক্ষা সংক্রান্ত প্রদর্শনী'র (Education Week and Exhibition) আয়োজন করা হয়। শিক্ষার সমস্যাকে কিভাবে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে মোকাবিলা করা যায়, সারা দেশের শিক্ষকদের নিকট তা তুলে ধরাই ছিল শিক্ষা সপ্তাহের মূল উদ্দেশ্য। (সূত্রঃ ঐ, প. ১৭২)

স্যার আজিজুল হক বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি বাংলা থেকে অশিক্ষার অভিশাপ মুছে দিতে বহু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষার সার্বিক উন্নতিকল্পে তিনি নিজেকে আত্মোৎসর্গ করেন। পরে, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য এক আইনও পাশ করেন। (সূত্রঃ ডঃ মহাম্মদ আমীর আলী, শান্তিপুর ও মুসলমান সমাজ, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ১০৩)

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। মাদ্রাসা শিক্ষার কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি আছে বলে তিনি মনে করতেন। মাদ্রাসায় যুগোপযোগী শিক্ষা প্রচলনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি বিলুপ্তির আমি প্রবক্তা নই, শত বর্ষাধিক কালোত্তীর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানের মূল সমাজজীবনের অনেক গভীরে প্রসারিত হয়ে গেছে। সমস্যাটি হচ্ছে, কি করে এখনকার শিক্ষা কাঠামো ও অধ্যয়নসূচী এমনভাবে প্রস্তুত করা যায়, যাতে বর্তমানে মানবীয় কর্মশক্তির ও কর্মদক্ষতার যে অপব্যয় হচ্ছে, তা রোধ করে যুবসম্প্রদায়কে দেশের জন্য হিতকর ও দেশের শ্রী নাগরিকরূপে এবং ইসলামের যোগ্য অনুসারী করে গড়ে তোলা যায়। এর উপরেই বাংলায় আমাদের ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। (সূত্রঃ মোহাম্মদ আজিজুল হক, History and Problems of Moslem Education in Bengal (মূল) মুস্তাদা নূরউল ইসলাম (অনুদিত) বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ৯০)

উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুদূরপ্রসারী। সমৃদ্ধ ভারত নিয়ে তাঁর একটি স্বতন্ত্র স্বপ্ন ছিল। নারী শিক্ষার উন্নয়নে তাঁর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। নারী শিক্ষার উন্নয়নে তিনি 'A Board of Women's Education' গঠন করতে চেয়েছিলেন। (সূত্রঃ Proceedings of Bengal Legislative Council, 23 March 1936, P. 379) তাঁর শিক্ষা মন্ত্রীত্বকালে সরকারী বিদ্যালয়সমূহে বাধ্যতামূলক টিফিন (Compulsory tiffin) প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় এবং রাজশাহীতে 'Agricultural Institute' প্রতিষ্ঠা করা হয়। (সূত্রঃ Proceeding of Bengal Legislative Assembly, 24th March 1947, P. 459)

৭. স্পীকার আজিজুল হক

আজিজুল হক নতুন সংবিধানের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত আইন পরিষদের প্রথম স্পীকার নির্বাচিত হন। তিনি পাঁচ বছর (১৯৩৭-১৯৪২) এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বাংলার বিধানসভার প্রথম নির্বাচিত স্পীকার। তিনি অধ্যক্ষ নির্বাচনে তমিজউদ্দিন ও কুমার শিবশেখরেশ্বর রায়কে পরাজিত করে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে বিধানসভার স্পীকার বা অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। কংগ্রেস সমর্থিত কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় পান ৮৩টি ভোট, কৃষক প্রজা পার্টি দলের সমর্থিত তমিজউদ্দিন খান পান ৪২টি ভোট। অপরদিকে ইউরোপীয়ান ও কোয়ালিশন সমর্থিত স্যার মুহাম্মদ আজিজুল হক পান ১১৬টি ভোট। পরবর্তীকালে তমিজউদ্দিন খান নিজের প্রার্থী পদের নাম প্রত্যাহার করে নিলে দ্বিতীয়বার ভোটগ্রহণ করলে দেখা যায় যে, শিব শেখরেশ্বর রায় আগের থেকে একটি ভোট কম পেয়ে ৮২টি ভোট পেয়েছেন। আর আজিজুল হক ভোট পেয়েছেন ১৫৮টি। যাহোক একথা সত্য যে, আজিজুল হকই একমাত্র ব্যক্তি যিনি স্পীকারের নিজস্ব দফতর গড়ে তোলেন, যা ছিল অভিনব এবং সারা ভারতের জন্য অনুকরণীয়। তিনিই ছিলেন অবিভক্ত বিধানসভার রূপকার। (সূত্রঃ পূবের কলম, ঈদ সংখ্যা ২০১৯, পৃ ৯৩-৯৫) সাংবাদিক কালিপদ বিশ্বাস তাঁর "যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়" নামক গ্রন্থে বলেন, "স্পিকার হিসাবে আজিজুল বর্তমান বিধানসভার গোড়াপত্তন করে গেছেন।" (সূত্রঃ কালিপদ বিশ্বাস, যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়, কলকাতা, ২০১২, পৃ ৮৩)

৮. ভাইস চ্যান্সেলর আজিজুল হক

সমস্ত বাঙলার বিধানসভার স্পীকার থাকাকালে আজিজুল হক প্রথম দফা ১৯৩৮ সালে দুবছরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন এবং দ্বিতীয় দফায় ঐ পদে নিযুক্ত হন ১৯৪০ সালে। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। তিনি একাধারে ৪বছর স্পীকার ও ভাইস-চ্যান্সেলর এই দুটি উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন। ভাইস চ্যান্সেলররূপে তিনি যথেষ্ট শিক্ষাসেবা করেন। ১৯৪০ খ্রীঃ জুলাই মাসে তিনি কোন কোন মহলের বিরোধীতা সত্ত্বেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়টি খোলার ব্যবস্থা করেন। প্রথমদিকে ঐ বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য উপযুক্ত ও দক্ষ শিক্ষক পেতে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়। বাধ্য হয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব সম্পাদন ও শিক্ষকতা উভয় দায়িত্ব অতি সুচারুভাবে সম্পাদন করেন।

(সূত্রঃ ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে বাঙলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২১১-১২)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘ইসলামের ইতিহাস’ ও সংস্কৃতি বিভাগ-এর প্রবর্তন তার জীবনের এক অন্যতম কৃতিত্ব।

৯. আজিজুল হক ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ও আজিজুল হক – দুই কৃতী বাঙালী গভীর সম্পর্কের প্রত্যয়ে আবদ্ধ ছিলেন। দুইজন ‘স্যার’ ও ‘নাইট’ উপাধিপ্রাপ্ত। ব্রিটিশ রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দুইজনে ‘নাইট’ উপাধি ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথের সাথে আজিজুল হকের যোগাযোগ ঘটে ১৯৩০-এর দশকে। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত

কুমার মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতী বার্ষিক প্রতিবেদনের বেসরকারি পরিদর্শক তালিকার বরাত দিয়ে জানিয়েছেন যে, ১৯৩০ সালে যখন তিনি কৃষ্ণনগর কোর্টের উকিল তখন তিনি শান্তিনিকেতন দেখিতে আসেন। সমকালীন সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে দুই শিক্ষাবিদের মধ্যে পত্রালাপ হত। পারস্পরিক পত্রালাপে দুই শিক্ষাবিদ অন্তরের দিক হতে একান্ত আপন হয়ে উঠেছিলেন।

আজিজুল হকের লেখা 'The Man Behind the plough' রবীন্দ্রনাথের হস্তগত হলে, তিনি বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বইটির বাংলা অনুবাদের অনুরোধ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্যার আজিজুল হককে ১৯৩৯ সালের ২রা জুলাই একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন "এখানে তোমার ইংরাজী বইখানা লাঙ্গলের পিছনকার মানুষটি আমার হাতে পড়ল। বাংলাদেশের এই উপেক্ষিত অকিঞ্চনদের জীবনযাত্রার সুবিস্তৃর্ণ ভূমিকাটি তুমি যেরকম বিস্তারিতভাবে বিবৃত করেছো এমন আমি আর কোন বইয়ে দেখিনি। তোমার নিরলংকার বাস্তব বর্ণনার ভিতর দিয়ে বাঙালী কৃষিজীবীর দুভার্গ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই বইখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি শিক্ষাবিভাগে পাঠ্যরূপে গণ্য হওয়া উচিত।

মোহাম্মদ আজিজুল হক আরও একবার রবীন্দ্র সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমন্ত্রণে স্যার আজিজুল হক শ্রীনিকেতনের বার্ষিক সমাবর্তনে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করার জন্য ১৯৪০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী শান্তিনিকেতনে আসেন এবং অনুষ্ঠানের অংশরূপে আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। (সূত্রঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি, তৃতীয় খন্ড, প্রথম ভাগ, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২০৫-২০৮)

১০. সম্মাননা

আজিজুল হক ১৯২৬ খ্রীঃ 'খান বাহাদুর' ১৯৩৭ খ্রীঃ C.I.E, ১৯৩৯ খ্রীঃ 'নাইট' (Knight) উপাধি পান। অবিভক্ত বঙ্গের বগুড়ায় তাঁর নামে আজিজুল হক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪০-এর দশকে। ১৯৪৬ খ্রীঃ তিনি K.C.S.I. উপাধি পান। ১৯৪২ খ্রীঃ তাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক D.Litt উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯৪৬ খ্রীঃ মুসলিমলীগের আহবানে সাড়া দিয়ে তিনি ব্রিটিশ প্রদত্ত উপাধিগুলি পরিত্যাগ করেন।

(সূত্রঃ The Man behind the plough বই-এর
শেষ প্রচ্ছদ পাতা)

১১. উপসংহার

১৯৪৭ খ্রীঃ ২২শে মার্চ মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তাঁর মৃত্যু দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর। তাঁর চিন্তাভাবনা তরুণ প্রজন্মের কাছে পাথেয় স্বরূপ। ৫৫ বছরের জীবনে তিনি এত কাজ করেছেন যে, তিনি মানুষের পা নিয়ে জন্মেছেন, কিন্তু সর্বত্র দৈত্যের পদচারণা করেছেন। একজন সৎ রাজনীতিক হিসাবে তিনি আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

পরিশিষ্ট

স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর 'The Gift of India' নামক ইংরাজী কবিতাটি বাংলায় পদ্যে অনুবাদ করেন। অনূদিত কবিতাটির নাম 'ভারতের দান'। আজিজুল হকের কবিতা রচনার নিদর্শন হিসাবে কবিতাটি এখানে পরিবেশিত হল।

ভারতের দান

মোর কাঞ্চন ধন বিভব রতন কনক শস্যরাজি
আমি সকলি তোমায় সঁপেছি যতনে ভরিয়ে অমল সাজি।
এই বুকের মাণিক সন্তানগুলি পাঠায়েছি তব কাজে,
আমি মা হ'য়ে তাদের দিয়েছি সমরে পরা'য়ে বীরের সাজে।
যবে কর্ম্মভেরীর শুনেছি আহবান মুছিয়া ফেলেছি গ্লানি,
শুধু তোমারি কার্য্যে সঁপেছি তাদের শুনা'য়ে আশীষ বাণী।
ওগো সহসা আমরা রত্নমালিকা ছিড়িল কণ্ঠমূলে,
কত ঝরিল মুকুতা সুযশ-ধবল পারস্য-উপকূলে,
সেই বালুকাধসর মিসরভূমিতে লুটা'ল কত না শির,
রণে মলিন-কপোল ছিন্ন-হস্ত আমার অযুত বীর।
আহা কালের কঠোর অসিতে ছুটিল ফ্রান্সে সে লহুধারা,
মোর হৃদিকুঞ্জের দ্রাক্ষাপুঞ্জ কত না সেথায় হারা।
আজি নয়নের নীর ঝর ঝর করি ঝরিছে তাদের লাগি,
আযি তাহাদের স্মৃতি বক্ষে ধরিয়া-দিবস-রজনী জাগি।
শত নিরাশার মাঝে সম্বল মোর তাদের কাহিনী স্মরি,
দেখ অটুট গবের্ব আমার বক্ষ রয়েছে সতত ভরি।
ঘন আঁধার-মথিত হৃদয়ে আমার আশার স্বপন জ্বলে,
আজি উড়িছে তোমার বিজয় নিশান চৌদিকে জলে থলে।
ওগো ভয়-বিভীষিকা ঝটিকা তুফান সকলি কেটেছ আজ,
দেখি নুতন করিয়া গড়িছ জীবন শান্তি-সিনান মাঝ।
জেনো মোসলেম বীর অযুত অযুত জীবন সঁপিল যারা,

তারা পরের বেদনা আপন করিয়া ঢেলেছে শোণিত-ধারা।
এবে ন্যায়-রক্ষণে শান্তির মাঝে হাসিছে জগৎ-ভূমি,
ওগো ভুলিবে কি মোর শহীদ তনয়ে, স্মরিবে কি আজি তুমি?

—মোহাম্মদ আজিজুল হক

(সূত্রঃ ইকবাল ভূঁইয়া, স্যার আজিজুল হক, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ, ১১৪)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
কুতুবউদ্দিন বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
যতীন্দ্র-রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালয়
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ

Helpline

1800 120 2130

Visit Us at

http://www.wbmdfc.org/

WEST BENGAL MINORITIES' DEVELOPMENT AND FINANCE CORPORATION

(A Statutory Corporation of Govt. of West Bengal)

"AMBER" DD-27/E, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064